এইসময়
সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

সাহিত্য একটা তীব্র নেশা, রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যাকে একবার এই নেশা ধরে, তার আর অন্য কোনো গতি থাকে না।
— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গবেষণা

স্নাতকরাও পিএইচডি প্রোগ্রামে নাম লেখাতে পারবেন, জানাল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। পিএইচডি উপাধি লাভের জন্য গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের নিয়মটিও প্রত্যাহৃত হচ্ছে। এর ফলে দেশে আরও বেশি পিএইচডি হবে, অনেক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর ছাড়া পড়ুয়াদের সরাসরি পিএইচডি-তে সুযোগ দেবে। ছাত্রছাত্রীদের সময় বাঁচবে, টাকাও বাঁচবে। কিন্তু, অধিকাংশই পাখির চোখে স্থির— স্নাতকোত্তরে না করার অর্থ গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ। প্রতিষ্ঠানগুলিও হয়তো ছাত্রছাত্রীদের থেকে সে আশাই করবে।

কোনও বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার অভিমুখ স্নাতকোত্তর স্তরেই তৈরি হয়, সেখানে গবেষণাপত্র লিখতে হয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের অনার্স কোর্সের শেষ বছরটি গবেষণার জন্য বরাদ্দ। যাঁরা ভালো ফল করতে পারবেন, তাঁদের পক্ষে ইউজিসি-র সংস্কার কার্যকরী। কিন্তু অধ্যাপকদের মত, এতে মূল বিষয়ে পড়াশোনা মাত্র তিন সিমেস্টারেই সীমিত। ইউজিসি-কে নিশ্চিত করতে হবে যে, পিএইচডি কোর্সওয়ার্কে যেন স্নাতকোত্তরের জরুরি অংশগুলি থাকে। পিএইচডি গবেষক ভবিষ্যতে স্নাতক স্তরে পড়াবেন, গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হবেন, তাই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে শিক্ষকতার মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫,০০০ পড়ুয়া পিএইচডি ডিগ্রি পান, ভারতে সেই সংখ্যা ৩৯,০০০। আবার পিএইচডি-তে ভর্তি হন ২০০,০০০। গত সাত বছরে এ দেশে পড়ুয়া ভর্তি ও ডিগ্রি লাভের সংখ্যা যথাক্রমে ১০০% ও ৭০% বেড়েছে। অর্থাৎ, সংখ্যা ও মান সমানুপাতিক নয়। ভারতে পিএইচডি গবেষণাপত্রের মূল্যায়ন যথেষ্ট কঠোর নয়— এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতেই গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের নিয়ম চালু হয়। তা থেকে সরে এলে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই আছে। গবেষণা-প্রবন্ধের বদলে গবেষক শুধু গবেষণাপত্রে মন দিতে পারবেন। কিন্তু, ‘স্কোপাস’ তালিকাভুক্ত জার্নালে ভালো মানের প্রবন্ধ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা গবেষকের আকাঙ্ক্ষাটি উঁচু তারে বাঁধে। ২,৫০০ গবেষকের মধ্যে এক সমীক্ষা দেখায় যে, সেরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ৭৫% প্রবন্ধই ‘স্কোপাস’ জার্নালে নয়, আইআইটি-তে ছবিটি বিপরীত। কারণ, বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে ‘স্কোপাস’ জার্নাল ৩০,০০০, কলা ও সমাজবিজ্ঞানে ১৪,০০০। সব বিষয়ে একই হিসাব চলে পারে না। কোথাও স্নাতকোত্তর জরুরি, কোথাও নয়। ইউজিসি-র সতর্কতা বিধেয়।

উদ্যোগ

বাঙালি আর যা-ই হোক, নিজের ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে খুব একটা ঢাকঢোল পেটানোতে নেই। একদা বাণিজ্য এবং লক্ষ্মীর স্থায়ী বাসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তার প্রাত্যহিকতার অঙ্গ ছিল হয়তো, তবে বিগত বহু দশক যাবৎ এ জাতির অভিনিবেশ অন্যত্র, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিত্তকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার পরিশ্রম থেকে সে সাধারণত বিরতই থেকেছে। অতএব, কাল, পদ্মপাতায় জল এবং নিষ্ফলা বাজারে বিনিয়োগের মতোই, অপস্রিয়মান গণ্ডার এবং ভাণ্ডার, দুই-ই ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা প্রজন্মের ক্ষোভ উগরে দেওয়ার অছিলার অন্ত ছিল না। হালে এ অবস্থা খানিকটা হলেও কেটেছে। তার পিছনে কতখানি জেগে উঠে জাতির ত্রাণে কাণ্ডারীর মতো হাল ধরার সদিচ্ছা, আর কতখানিই বা উপায়হীন ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরে বাঁচার ঐকান্তিক তাগিদ, তা নিরূপণের সময় এখনও হয়নি। তবে কলেজ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি যে ব্যবসায়ী হওয়ার পথে অন্তরায় নয়, তা মেদিনীপুর শহরে দুই চায়ের দোকানের রমরমা ব্যবসা থেকেই পরিষ্কার। সরকারি চাকরিই এই জাতির একমাত্র ললাটলিখন নয়, তা দোকানের নাম, খদ্দের টানার অভিনব উপায় আবিষ্কার থেকেই স্বচ্ছ। এই ধরনের চায়ের দোকান গজাচ্ছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, সেগুলি জনপ্রিয়ও। উদ্যোগ হিসেবেও চমৎকার। এগুলি ছোটো হলেও সুচিন্তিত, দৃঢ় পদক্ষেপ। আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

অসংখ্যা

১৭৪৩০০০
০০০০০০০

(সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার কোটি) মার্কিন ডলার— ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দিনকেদিন

৩০ সেপ্টেম্বর

১৯১৯: শিবনাথ শাস্ত্রী প্রয়াত হন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিখ্যাত বই ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ’।

১৯৯৩: মহারাষ্ট্রের লাতুর ও ওসমানাবাদ এলাকায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় ৯,৭৪৮ জন মানুষ মারা যান, আহত হন প্রায় ৩০,০০০ মানুষ। ধ্বংস হয় ৫২টি গ্রাম।

শক্তিপুজো

স্বামী সারদানন্দ

বোধিবৃক্ষ

সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যক্ত থাকিয়াও নির্বীর্য, ধর্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন। দোষ পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন, ভোজন এবং নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসনা অঙ্গহীন। মহামারীর প্রতিবিধান-উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য-পানীয়ের বিচার না রাখিয়া কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চরোলে হরি-সঙ্কীর্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তাহার ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। দুর্ভিক্ষের করাল বদন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাকালীর পূজা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপযোগী উপায়-সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না রাখে, তাহার আরাধনাও অঙ্গহীন বই আর কি বলা যাইবে? স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতা দানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে? কথায় বলে, ‘যে বিবাহের যে মন্ত্র’ তাহার উচ্চারণ চাই। এইরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিব, ‘পূজার ফল তো পাইলাম না’। শাস্ত্র তো বার বার বলিতেছেন, কোন কার্য সুসিদ্ধ হইতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন— উপযুক্ত দেশ, উদ্যমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাম, বার বার উদ্যম এবং দৈব। (‘গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা’ থেকে গৃহীত)

স্বামী-মৃত্যুর পর শাখা ভাঙা, সিঁদুর মোছা ইত্যাদি প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্রের দুই পঞ্চায়েত

বঙ্গসমাজও পূজাকর্মে বিধবাদের স্বাগত জানাক

বাঙালি দুর্গা পূজার অনেক পুরনো ছকই ভেঙেছে। বিধবাদের সরিয়ে রাখার অমানবিক ছকটাও ভাঙুক, মহারাষ্ট্রের মতো। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

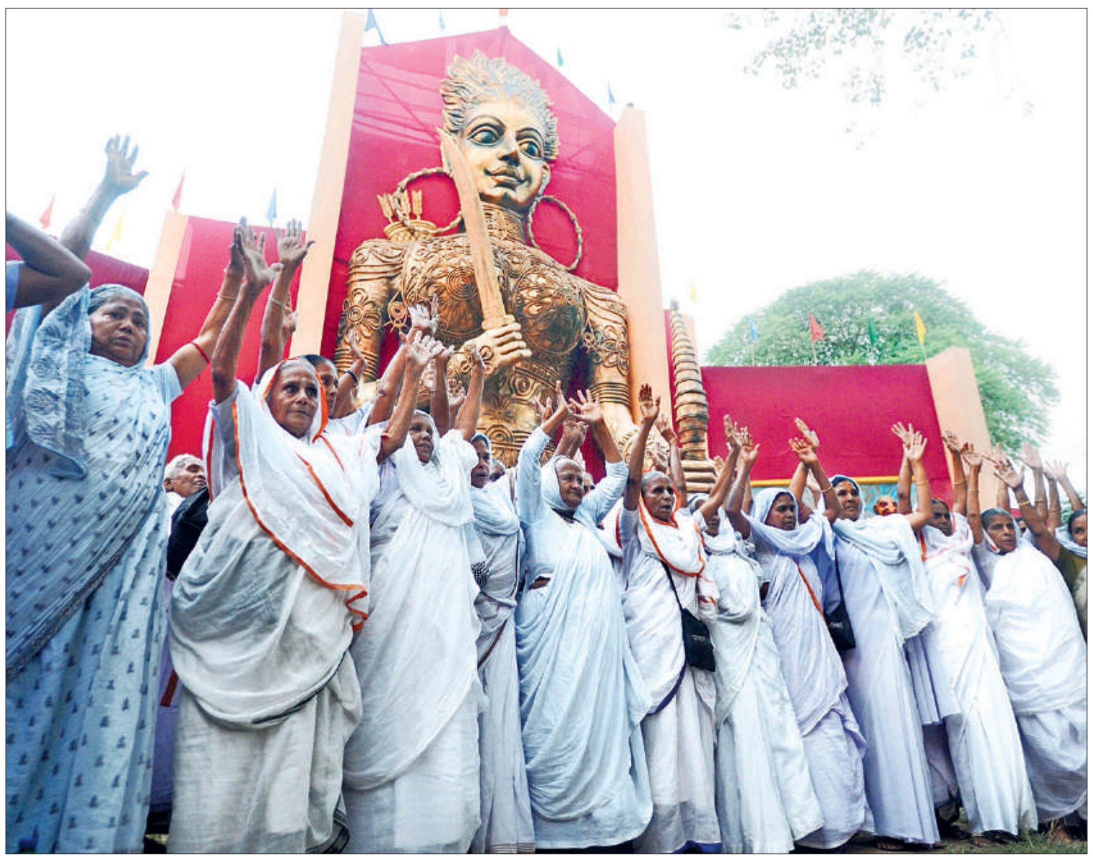

পিয়াল ভট্টাচার্য

এক কাকিমাকে জানতাম, অনেক কাকিমা-মাসিমাদের মতোই তিনি একটি দুর্গাপুজোর নিয়মকানুনের মধ্যমণি। কোন দিন পুজোয় কী উপচার লাগবে, কখন লাগবে, সব তাঁর কণ্ঠস্থ। বাকি বউদিরা তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। স্বামী গত হবার পরে তিনি শুধু বেশি রাতের দিকে এসে তাঁর প্রিয় পুজোর প্রতিমাটিকে একবার প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন। আর এক দিদি, তাঁর বাবা চলে যাওয়ার পর তিনি পুজোর নিয়মকানুন জানা আর মানার সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড হলেও সে বার পুজোয় আর থাকতে চাইলেন না, তাঁর তো কালাশৌচ চলছে, যদি তাঁর অংশগ্রহণে কেউ কোনও বাঁকা মন্তব্য করে!

বিধবারা ব্রাত্য?

এই বছরের দুর্গাপুজো তো সত্যি সত্যিই বিশেষ। একে তো গত দু’বছরের বিধিনিষেধের পরে এ বার লোকের মনে হয়েছে অতিমারীর ভয় যেন একটু কমেছে, তার উপরে দুর্গা পুজো ইউনেস্কোর ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক পরম্পরার স্বীকৃতি পেয়েছে। তা হলে এ বারে তো পুজো আরওই উজ্জ্বল, উচ্ছল, বর্ণময়। আমরা তো নানা ভাবে ছক ভাঙছি। তা হলে আমাদের ছকভাঙাকে আরও একটু প্রসারিত, আর একটু মানবিক, আর একটু দুঃসাহসী করে তোলার কথা ভাবতে পারব না কেন? কেন আমাদের চারপাশের বিধবা মা-মাসিমা-কাকিমা-দিদি-বউদি-মামিমাদের পুজোর আয়োজনে সাদরে ডেকে নিতে পারব না? শুধু ফল বা সবজি কাটা বা রান্না করার পরোক্ষ সহায়তা নয়, কেন প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের সাদরে জড়িয়ে নেওয়া হবে না পুরো প্রক্রিয়ায়? অমঙ্গলের ভয়? কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বিধবারা পুজোর ডালি ছুঁলে সকলের অমঙ্গল? যদি কেউ নিজে শোককে পাশে রেখে, কালাশৌচকে পেরিয়ে যোগ দিতে চান, তাঁকে কেন ঠাঁই দিতে পারব না?

এয়োস্ত্রীদের সব কিছুর কেন্দ্রে রাখা তো একটা লোকাচার, শাস্ত্র কি সেখানে এগিয়ে কিছু নিদান দিয়েছে? বরং ‘স্ত্রী’র আর এক প্রতিশব্দ তো সহধর্মিণী, একত্রে ধর্মাচরণ করার কথা। স্বামী না থাকলেই ধর্মই তাঁকে ধর্মীয় সব আচার থেকে বঞ্চিত করে দেবে? বিধবাদের পরিবার থেকে, জীবন থেকে, লোকের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দিতে চেয়েছে বলে স্বামী হারানোর শোক বোঝার আগেই দেগে দিয়েছে ভাগ্যহীনা বলে। জোর করে সধবার সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে, সেই মুহূর্তেই। আর এক বিধবা এসে তাঁর শাঁখা ভেঙে দেবেন, যে শব্দটা কিনা মেয়েদের মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করা নিষেধ, যে জন্যে সধবা অবস্থায় শাঁখা ভাঙলে বলা হয় ‘বেড়ে গেছে’। সিঁদুর মুছিয়ে দেওয়া হবে, কপালে টিপ পরা নিষিদ্ধ, রঙিন কাপড় পরা বারণ, আভরণেও পরিমিতি। তিনি যেন সারা শরীরে শোকের চিহ্ন প্রদর্শন করে বেড়ান, খুব কুণ্ঠার সঙ্গে— সেটাই তাঁর বাঁচার একমাত্র শর্ত। কিন্তু যে দেশে স্বামী স্ত্রীর থেকে বয়সে বড়ো হবেন এটাই রীতি, আর সমান স্বাস্থ্য-পুষ্টি-চিকিৎসা পেলে মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি বাঁচবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম, সেখানে তো বিধবা হয়ে বাঁচাটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও এখন মেয়েদের প্রত্যাশিত আয়ু (৭২ বছর) ছেলেদের (৭০ বছর) চেয়ে বেশি, তাই জনসংখ্যায় বিধবাদের সংখ্যা বিপত্নীকদের থেকে বেশি। এ ছাড়া গত দু’বছরে করোনা, দারিদ্র, অপুষ্টি, জীবিকাহীনতা বহু ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান রোজগেরেকে কেড়ে নিয়েছে। বেড়েছে অল্পবয়সী বিধবাদের সংখ্যা। বৈধব্য যদি জীবনচক্রের এক অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হয়, এখনকার মানুষরা সেটাকে ‘দুর্ভাগ্য’ বলে চিহ্নিত করব কেন? কেন বিধবাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকী পূজার্চনার ক্ষেত্রেও সমান অধিকার মেনে নেবনা? এই দুর্গাপুজোতেই আমরা আনন্দের জোয়ারে ভেসে গিয়ে চারপাশের বিধবাদের জড়িয়ে নিতে পারি না? বৃন্দাবনের বিধবাদের এনে পুজো ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তাঁদের সেই পরিচিত নরকে ফেলে আসা শুধু নয়, চারপাশের বিধবারা, যাঁরা পুজোতে থাকতে চান, তাঁদের জড়িয়ে নেওয়া যায় না? হয়তো অনেক বিধবারা নিজেরাই যোগ দিতে ইতস্তত করবেন, অনেকেই হয়তো ইচ্ছে থাকলেও অন্যের চাপা কটূক্তির ভয় পাবেন। কিন্তু এবার চেষ্টাটুকু শুরু করা যায় না? যদি সিঁদুরখেলায় বিবাহিতা-অবিবাহিতার ভেদরেখা মুছে যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে হবে না কেন?

দৃষ্টান্ত মহারাষ্ট্র

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার এক ছোট পঞ্চায়েত তো সেই উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে কোভিডে, বন্যায়, কৃষক আত্মহত্যায় অনেক অনেক অল্পবয়সী বিধবা। তাই গত ৪ মে, ২০২২ তারিখে কোলাপুর জেলার শিরোল তহসিলের হেরোয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েত একেবারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ত্রীদের চুড়ি ভেঙে দেওয়া, ‘কুমকুম’ (সিঁদুর) মুছিয়ে দেওয়া, মঙ্গলসূত্র আর পায়ের আংটি (বিছিয়া) খুলিয়ে দেওয়া, সাদা শাড়ি পরানোর চিরাচরিত রীতিকে নিষিদ্ধ করেছে। আর একটি স্থানীয় পঞ্চায়েত, মঙ্গাও, একই সিদ্ধান্ত নেয় ১০ মে তারিখে। তার পর তৎকালীন উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ‘কোলাপুর মডেল’ অনুসরণ করে কোনও সদ্য স্বামী-প্রয়াতাকে বৈধব্যের আচারের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করাকে নিষিদ্ধ করে সার্কুলার জারি করে ১৯ মে।

সমস্ত জেলা পরিষদের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হল সেই নির্দেশ অনুসরণ করতে। প্রায় ২৮ হাজার পঞ্চায়েতের কোথাও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। বরং সরকারি নির্দেশিকায় লেখা হয়, ‘ভারত এক বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও কুমকুম মুছে দেওয়া, চুড়ি ভেঙে, মঙ্গলসূত্র খুলে নেওয়ার মতো কুপ্রথা এখনও রয়েছে। কোলাপুরের হেরোয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রথাগুলি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরপঞ্চ সুরগুন্ডা পাটিল আর গ্রামোন্নয়ন অফিসার পল্লবী কোলকারের সভাপতিত্বে গ্রামসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদমাধ্যমও প্রচার করেছে। ফলস্বরূপ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ... কোলাপুরের বন্যা আর কোভিড-১৯ অতিমারিতে বহু পরিবার তাঁদের মূল উপার্জনকারীকে হারিয়েছেন। বিধবাদের সম্মান প্রদর্শন করতে আর তাঁদের যাতে কোনও ভাবে সামাজিক বয়কটের মুখে পড়তে না হয়, সে জন্যই গ্রামসভা এই সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোলাপুর হল রাজর্ষি ছত্রপতি শাহজি মহারাজের জেলা। শাহজি, যিনি বিধবাদের জীবনকে উন্নত করার জন্যে নানা পদক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে গ্রাম পঞ্চায়েত এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছে’।

এই বলে এক দিকে শাহজির পরম্পরার সঙ্গে নিজেদের সদিচ্ছাকে জড়িয়ে দিয়ে, অন্য দিকে এটি বাধ্যতামূলক না করে বরং উদাহরণস্বরূপ এবং কাম্য বলে লিখে উদ্ধব ঠাকরের সরকার স্বস্তিজনক মধ্যপন্থা নিয়েছিল। তার পর উদ্ধবের সরকার পড়ে গিয়ে এখন একনাথ শিন্ডে সরকার বানালেন। তবে এই নির্দেশ বদলায়নি।

> মঙ্গাও গ্রাম পঞ্চায়েত, আরও এক পা এগিয়ে গিয়েছে। যে পরিবারগুলি বৈধব্যের আচারগুলি পালন করবে না বলে জানতে পারা যাবে, তাদের একটি শংসাপত্র আর পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে।

ফুলে সমাজ সেবা মণ্ডল

শুরুতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন হেরোয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রকাশ জিঙ্গারে, মহাত্মা ফুলে সমাজ সেবা মণ্ডল নামে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। কোভিডের প্রথম তরঙ্গে আর এক পঞ্চায়েত সদস্যের অকালমৃত্যুর পরে বৈধব্যের আচারের নামে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যা করা হয়, তাতে তিনি খুব আহত হন কারণ এই আচার মেয়েটির শোককে আরওই বাড়িয়ে দিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে লিখলেন। তার পরে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন, পঞ্চায়েতের সদস্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। সবাই তাঁর ভাবনাকে সমর্থন করে। তখন পরীক্ষামূলক ভাবে তিনি একটি স্ট্যাম্প পেপার কিনে লেখেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীকে বৈধব্যের আচার অনুসরণ করতে বাধ্য করা যাবে না। তাঁকে অনুসরণ করে আরও প্রায় এক ডজন মানুষ একই ভাবে স্ট্যাম্প পেপারে লেখেন। এ বার হেরোয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকাশকে বলে তাঁরা গ্রামসভাতে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চান। তার পরে ৪ মে’র ঘটনা। অন্য দিকে মঙ্গাও গ্রাম পঞ্চায়েত, যাঁদের সম্বন্ধে আগেই লিখেছি, তাঁরা আরও এক পা এগিয়ে গিয়েছে। যে পরিবারগুলি বৈধব্যের আচারগুলি পালন করবে না বলে জানতে পারা যাবে, তাদের একটি শংসাপত্র আর পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়াও সেই পরিবারগুলির জলকর আর সম্পদ কর এক বছরের জন্যে মকুব করা হবে।

অদৃশ্য সমস্যা

ভারতে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বিধবা রয়েছেন (২০১৮), ভারতীয় মেয়েদের সংখ্যার ১০ শতাংশের কাছাকাছি। সারা পৃথিবীতে আছেন প্রায় ছাব্বিশ কোটি বিধবা, বলছে রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য। সংঘর্ষে, অনাহারে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, অতিমারী পরিস্থিতিতে বিধবার সংখ্যা আরওই বাড়ে। যেমন সংঘর্ষে লিপ্ত আফ্রিকার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর বহু জেলায় অর্ধেক মেয়েই বিধবা। মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু বাড়ছে, এখন সমাজে অনেক অনেক বিধবা থাকবেন। তাঁদের নিয়ে এটুকু ভাবনা তো প্রয়োজন। তার পরেও তাঁদের স্বামীর ভাগের জমি হাতিয়ে নেওয়া হবে, পেটভাতায় ভাসুরের জমিতে মজুর খেটে ছেলেমেয়েদের বড়ো করতে হবে, পরিবারের মধ্যে বা বাইরে যৌন হেনস্থার শিকার হতে হবে। যেমন আমাদের দেশের মেয়েদের কাজে যোগদানের হারে দেখা যাচ্ছে বিবাহিতা মেয়েরা ক্রমশই অর্থকরী কাজের জগত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন, বাড়ছে একলা মেয়েদের কাজে যোগদানের হার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হলেন বিধবারা। বিবাহিতাদের মাথার উপরে ছাতার মতো স্বামী বিরাজমান, তাই চলতি মজুরির হারে বা অর্থকরী কাজের শর্তে তাঁরা বাইরের কাজে যোগ দিতে চান না, বিধবা বা একলা মেয়েদের সে উপায় নেই।

তাই অদৃশ্য বিধবাদের অন্তর্ভুক্তি এই দুর্গাপূজা থেকেই শুরু হোক, সারা ভারত যখন প্রশ্ন করে কাশী-বৃন্দাবন-মথুরাতে বিধবাদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা কেন সবচেয়ে বেশি, তার উত্তর এবার আমাদের মা দুর্গাই দিন।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

সিংহ তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ

ইন্ডিপপ

ইন্দ্রজিৎ হাজরা

শিং নেই তবু সিংহ হেব্বি লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, কোনও পুজো প্যান্ডেলে যখনই যাই, চোখ আমার প্রথমে পড়ে সিংহ মামার ওপর, মা দুর্গার ওপর নয়। সব মূর্তির মধ্যে দু’জনই পেশল, বলিষ্ঠ — মহিষাসুর মশাই আর সিংহ। কার্তিকের হৃতিক রোশন-মার্কা ছিপছিপে চেহারা হতে পারে, কিন্তু খাঁটি বলের চিহ্ন কম। আর সিংহ ও মহিষাসুর বাদে বাকিদের মুখে শান্তি উপচে পড়ছে। দুর্গা যেন অসুরের গায়ে বর্শা বিদ্ধ করছেন পরিবারের সঙ্গে নেটফ্লিক্স দেখতে দেখতে। এ দিকে একমাত্র সিংহ আর মহিষাসুরের মুখে লড়াইয়ের হিংস্রতার ছাপ।

তবে বাঘ থাকতে সিংহ? প্রাচীন ভারতে সিংহ ছিল বটে, তবে বাঘ, বিশেষত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারে চড়ে মহিষাসুরমর্দন করলে বেশি মানানসই হত কি? অনেক পুরনো চিত্রাঙ্কনে দুর্গাকে বাঘের পিঠে দেখায় বটে, তবে পুজো প্যান্ডেলে ক্যাপ্টেন স্পার্কের ‘আফ্রিকার রাজা’ই রাজা। ইঁদুর, রাজহাঁস, পেঁচা, ময়ূর— আর সিংহ। বুঝতেই পারছেন কওন সিকন্দর। অনেক পুরনো বাড়ির পুজোয় সিংহটা ঘোড়ার চেহারা নেয়। একটা বিশাল গ্রেহাউন্ড কুকুরের মতো ‘সিংহ’ও দেখেছি। কিন্তু আমার সিংহ অবতারে সিংহই সব থেকে খাসা লাগে।

কারিগরের হাতে কেশরীই হয় সব থেকে বাস্তবসম্মত। অলঙ্কার কম, নিখুঁত ভাবে তুলে ধরাটাই শিল্পীর উদ্দেশ্য। কেশর ঝাঁকানি, অ্যাকশন সুপারহিরোর ভঙ্গি নিয়ে অসুরের হাতে বিশাল হাঁ আর ভয়ঙ্কর দাঁতের কামড় বা কামড়ানোর আগের মুহূর্তটি মাটি, রং আর আঁশের চুলে ফ্রিজ করা আছে। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ দুর্গাপুজোর মূর্তিশিল্পী শশিভূষণ পাল যখন রুকুকে পাঁচজন ঠাকুরের পাঁচটা বাহনের পরিচয় করাচ্ছিলেন, তখনও সিংহের রং-লোম লাগানো হয়নি। কিন্তু কাঁচা মাটিতেও বোঝা যাচ্ছে যে শশীবাবুর গড়া সিংহটি অন্য চার জন্তুর থেকে আরও অনেক বাস্তবসম্মত।

তবে একটা খটকা লাগে বটে। বাহন মানে তা-ই যা বহন করে, যানবাহন হিসেবে যে পশুকে ব্যবহার করা হয়। বুঝলাম পৌরাণিক ব্যাপার-স্যাপার, তাই গণেশ কী করে ইঁদুরের পিঠে ঘুরে বেড়াবে, ময়ূর কী করে কার্তিকের ভার সামলাবে, রাজহাঁস আর পেঁচাকে না হয় ছেড়েই দিলাম। আমার খটকাটা অন্য জায়গায়। মা দুর্গা বাপের বাড়ি আসেন চার প্রকার বাহনে— নৌকো, পালকি বা দোলা, ঘোড়া আর হাতি (হাতিটা গণেশকে দেখে কী ভাবে কে জানে)। তা হলে সিংহ?

এটার উত্তরও আমি অনেক চর্চা করে ষষ্ঠীর আগে

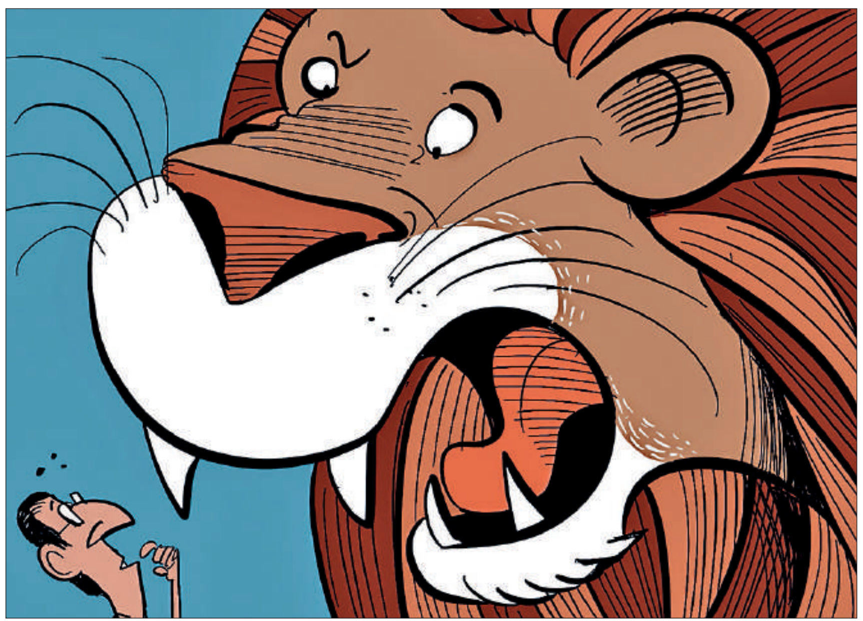

উদয় দেব

পেলাম ভাগ্যিস— সিংহ চড়ে দুর্গা যান কেবল রণক্ষেত্রে। ওটা দৈনন্দিন বা দূরগামী যাত্রার জন্যে নয়। কৈলাসে সিংহ মামা হয়তো থেকে যান নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে, নয়তো আলাদা করে মর্ত্যে আসেন ম্যাডামের সঙ্গে। তবে পুজোর মূর্তির জন্যে যে পোজ দেন দুর্গা, সিংহ আর মহিষাসুর, সেটা যুদ্ধের পুনঃপ্রচার। সেখানে ওলা, উবের, পালকি, নৌকো, ঘোড়া চলে না। চলে শুধু একটাই বাহন— শ্রী শ্রী সিংহ।

তবে বাঙালিদের সঙ্গে দুর্গার সিংহের আর একটা সংযোগ থাকতে পারে। নবকৃষ্ণ দেবের ১৭৫৭ সালে দুর্গা পুজোয় প্রধান অতিথি ছিলেন পলাশি-বিজয়ী রবার্ট ক্লাইভ। সেখানে ইংরেজের খাতিরে নাচ, গান, মদ, মাংস, সব কিছুর আয়োজন করা হয়েছিল। শোভাবাজারে নবকৃষ্ণের নতুন বাড়িতে এই দুর্গোৎসব, পার্টি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুলচিহ্ন বা কোট অফ আর্মস হল দুটো স্মিত সিংহ ঢাল ধরে দু’পায়ে দাঁড়িয়ে। নবকৃষ্ণ ক্লাইভের জন্যেই ধনসম্মান অর্জন করে রাজবাড়ী বানিয়েছেন। বাড়ির গেটের ওপর দুটো সিংহ, তাদের পায়ে একটা গোলক, কামানের গোলা না পৃথিবীর প্রতীক, আজ বলা মুশকিল কারণ অনেক দিন ধরেই ওটা রং হতে হতে ফুটবলের রূপ ধারণ করেছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড়দার খাতিরে কি দ্বারে সিংহ লাগানো হয়েছিল? সেই ১৭৫৭ সালে শোভাবাজার দুর্গা পার্টি দিয়েই শুরু হল বনেদি বড়লোক বাড়িতে দুর্গা পুজোর ধুমধামের রেওয়াজ। কে কত বড় করে, ইংরেজ চিফ গেস্ট ডেকে পুজো পার্টি ‘মানাতে’ পারে, তা প্রতিযোগিতার পর্যায়ে গেল তার পর থেকে। তবে কী করে নবকেষ্টকে টেক্কা দেওয়া যায়?

শোভাবাজার রাজবাড়ির গেটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-মার্কা সিংহ থাকলেও, দুর্গার বাহন থেকে গেল বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতো এক জন্তু, যা আজও আছে। বাকি বনেদি বাড়ির পুজোয় কি এই ঘোড়ামুখো সিংহকে কাটিয়ে সিংহের মতো সিংহকে দুর্গার বাহন করা শুরু হল সাহেবদের খোশামোদ করতে? আজ না হয় দেবী দুর্গার যুদ্ধরত সিংহ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রবেশদ্বারে বিশ্রামরত দুই মার্বেলের সিংহর সম্পর্ক নজরে পড়ে না। তবে কাল থেকে যখন ঠাকুর দেখতে বেরোবেন, দেখে বলবেন তো— এই আফ্রিকার রাজা আমাদের দুর্গামণ্ডপে কোন রাস্তা দিয়ে এসেছিল? বাহনের বাহন কি পালকি, ঘোড়া, নৌকো, হাতি? নাকি পালতোলা ইংরেজ জাহাজ?

> ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড়দার খাতিরে কি দ্বারে সিংহ লাগানো হয়েছিল? সেই ১৭৫৭ সালে দুর্গা পার্টি দিয়েই শুরু হল বনেদি বাড়িতে দুর্গা পুজোর ধুমধামের রেওয়াজ।

নাম দিয়ে যায় চেনা

গন্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া

সংসদ অভিধান বলছে ‘বাটপাড়’ শব্দের অর্থ ‘লোকের জিনিসপত্র লুটে নেয় বা ডাকাতি করে এমন দুর্বৃত্ত’। অতএব যে লোকের পদবি ‘বাটপাড়িয়া’, তাঁর চরিত্র কেমন হতে পারে, তা নাম থেকেই সহজবোধ্য। পরশুরাম তাঁর প্রথম গল্প ‘শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’-এ গন্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া নামের একটি সুচতুর বানিয়া চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলেন। কতিপয় বাঙালি এবং গন্ডেরিরাম মিলে ধর্মের নামে ব্যবসা ফেঁদে কী ভাবে সাধারণ মানুষকে সর্বস্বান্ত করবে, সেটিই গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য। তবে গন্ডেরিরাম শুধু প্রতারকই নয়, বাঙালিদের তুলনায় সে অনেক বেশি ঝুঁকিও নিতে পারে— ‘দুঃসাহসিক ব্যবসায়ী গন্ডেরিরাম আসরে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র নিমেষ মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা জমকালো হইয়া উঠিল, আকাশে যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল এবং দুই-চার হাজার হইতে আমরা এক লাফে দুই-চার লাখের জগতে উন্নীত হইলাম।’ বাটপাড়িয়ারা এখনও বহাত তবিয়তে, শুধু পদবিগুলো আলাদা।

লেখাটি পাঠিয়েছেন: অরুণাভ বসু
হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলকাতা ১২

এমন আর কোন কোন চরিত্র আছে যাদের নামের অর্থ থেকেই মালুম হয় তাদের কীর্তিকলাপ এবং বৈশিষ্ট্য?

আপনাদের এ রকম আরও চরিত্র মাথায় এলে নিশ্চয়ই হাত নেড়ে আপনার নাম এবং ঠিকানা সহ লিখে জানাবেন সঙ্গের এই ই-মেল ঠিকানায়:
pratisampadak.eisamay@gmail.com।